৪. ১৯১২–১৩ খ্রিস্টাব্দের বলকান যুদ্ধগুলির কারণসমূহ আলোচনা করো।

(ব. বি. ২০১০)

বার্লিন সন্ধির ফলে বলকান অঞ্চলের মানুষের ইচ্ছা পূরণ হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের বার্লিন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মন্টেনেগ্রো, রুমানিয়া ও সার্বিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। বুলগেরিয়াকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং এই দেশ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করলেও দেশ ভাগের ফলে বুলগেরিয়ার জনগণের ইচ্ছাপূরণ ঘটেনি। ইংল্যান্ডের সাইপ্রাস লাভ রাশিয়ার আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাসিডোনিয়ার অঞ্চলকে তুরস্কের সাথে রাখা অযৌক্তিক ছিল। বসনিয়া ও হারজেগোভিনার স্লাভ জনগণ সার্বিয়ার সাথে যুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু, তাদের অস্ট্রিয়ার সাথে যুক্ত করাতে তাদের ইচ্ছাপূরণ হয়নি। রুমানিয়ার কিছু অংশ রাশিয়াকে দিলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা রুষ্ট হয়।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বলকান অঞ্চলে দু'টি নতুন সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। আর্মেনিয়ায় তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটার ফলে তুর্কি সৈন্য আর্মেনিয়ার জনগণের উপর অত্যাচার করে। এই সময় প্রায় ৫০,০০০ আর্মেনীয় নিহত হয়। ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলো নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়।

আর্মেনীয়দের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও গ্রিকদের কার্যকলাপ বলকান সমস্যাকে জটিলতর করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রিটে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং ক্রিট স্বেচ্ছায় গ্রিসের

Scanned with CamScanner

সাথে সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। তুরস্ক বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয়। তখন গ্রিস ক্রিটকে সাহায্য করবে বলে তুরস্কের উপর আক্রমণ করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে গ্রিস পরাজিত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালির মধ্যস্থতায় ক্রিট স্ব-শাসন লাভ করে।

তুরস্কের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি: পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত তুরস্কের যুবকেরা একটি সংস্কারকামী দল গঠন করে। এই দল যে আন্দোলন করে তাই 'তরুণ তুর্কি আন্দোলন' (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) নামে ইতিহাসে চিহ্নিত। এই আন্দোলনকারীরা সুলতান দ্বিতীয় আবুল হামিদকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের জন্যে পার্লামেন্টে অধিবেশন ডাকতে বাধ্য করে। কিন্তু সুলতান কিছু দিনের মধ্যেই আবার স্বৈরাচারী শাসনে ফিরে যান। সেই সময় আন্দোলনকারীরা তাঁকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তার ভাই পঞ্চম মহম্মদকে সিংহাসনে বসায়।

তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ বলকান অঞ্চলে তুর্কি শাসনের অবসানের চেষ্টা শুরু হয়। অস্ট্রিয়া, বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা এই দুটি অঞ্চলকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গ্রিস, সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি নিজেরা 'বলকান লিগ' নামে রাষ্ট্রজোট তৈরি করে। এদের উদ্দেশ্যে ছিল তুরস্ক সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এই সংঘ তুর্কি সরকারকে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রিস্টানদের সাথে সুব্যবহার করতে বলে ও সরকার তা না মানলে সংঘ তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথম বলকান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি বলকান জাতীয়তাবোধের আগ্রাসী মনোভাব বন্ধ করার জন্য লন্ডনে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সম্মেলনের আহ্বান করে এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। চুক্তিতে ঠিক হয় যে, কনস্টান্টিনোপল ও তার চারপাশের অংশ তুরস্কের অধীন থাকবে।

লন্ডন সন্ধি: ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন সন্ধি অনুসারে প্রথম বলকান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই সন্ধি অনুযায়ী তুরস্কের শুধুমাত্র কনস্টানটিনোপল ব্যতীত সমস্ত কিছু হারাতে হয়। ক্রিট দ্বীপ গ্রিসের অধিকারে চলে যায়। অস্ট্রিয়ার আগ্রহে সার্বিয়ার ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য আলবেনিয়াকে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। প্রথম বলকান যুদ্ধ প্রমাণ করে যে বড় শক্তির সাহায্য ছাড়াই বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের চেষ্টাতেই ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যে পতন ঘটাতে সক্ষম।

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের কারণ: প্রথম বলকান যুদ্ধে বলকান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংহতি দেখা গেলেও যুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যুদ্ধের ভাগ

Scanned with CamScanner

বাঁটোয়ারা নিয়ে মতবিরোধ আরম্ভ হয়। ম্যাসিডোনিয়া ও আলবানিয়া ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। প্রথম বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই বলকান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে লভ্যাংশ ভাগ কীভাবে হবে তা ঠিক হয়ে যায়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, বুলগেরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার একটা বড় অংশ পাবে। আড্রিয়াটিক সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল সার্বিয়া পাবে। যুদ্ধ যতদিন চলছিল ততদিন বড় বড় শক্তিগুলো কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি। যুদ্ধের শেষে ইতালি এবং অস্ট্রিয়া হস্তক্ষেপ করে। তারা দাবি করে যে, আড্রিয়াটিক সমুদ্রের তীরে আলবেনিয়া নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইতালি এবং অস্ট্রিয়ার দাবিকে অগ্রাহ্য করার মতো ক্ষমতা বলকান রাষ্ট্রগুলোর ছিল না। এই দাবিকে তারা স্বীকার করে নেয়। ফলে সার্বিয়া ম্যাসিডোনিয়ার একটা বড় অংশ দাবি করে। সার্বিয়া এবং বুলগেরিযার মধ্যে ম্যাসিডোনিয়ার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অন্য দিকে রুমানিয়াও দাবি করে, ম্যাসিডোনিয়ার বেশির ভাগ অংশ বুলগেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলে বলকান অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্ট হবে। এই জন্য রুমানিয়াও ম্যাসিডোনিয়ার কিছু অংশ দাবি করে। এই রকম পরিস্থিতিতে বুলগেরিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। ফলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

বুখারেস্টের সন্ধি: দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে গ্রিস ও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষে যোগদান করে এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বলকান রাজ্যগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তুরস্ক বুলগেরিয়া বিরোধী মিত্র জোটে যোগদান করে। কারণ প্রথম বলকান যুদ্ধে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে পরাজিত করতে বুলগেরিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চারিদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে বুলগেরিয়া হেরে গিয়ে এক সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের অগস্ট মাসে বুখারেস্টের সন্ধির মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়। সার্বিয়া গ্রিস এবং মন্টেনেগ্রো বিশাল পরিমাণ অঞ্চল অধিকার করে। তুরস্ক তার হারিয়ে যাওয়া রাজ্যের কিছু অংশ আবার ফিরে পায়। বুলগেরিয়া দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের ফলে বেশির ভাগ অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে বুলগেরিয়া ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিবেশীর রাষ্ট্রগুলোর উপর তার বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব জেগে ওঠে। তুরস্কও প্রতিশোধ নেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে।

ফলাফল: এই দুটি বলকান যুদ্ধের ফলে নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু, ইউরোপীয় রাজনীতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। তুরস্ক ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত সাম্রাজ্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

Scanned with CamScanner

বুলগেরিয়ার শক্তি প্রথম দিকে বৃদ্ধি পেলেও বুখারেস্টের সন্ধির ফলে তার শক্তি হ্রাস পায়। বুলগেরিয়ার ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বীজ রোপিত হয়। এই জন্য বুলগেরিয়া তার হৃত গৌরব পুনোরুদ্ধারের জন্য জার্মানির সঙ্গে মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হয়। বুখারেস্টের সন্ধিতে সার্বিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হলে অস্ট্রিয়া ইর্ষান্বিত হয়। সার্বিয়াকে সে তার মূল শত্রু মনে করতে থাকে। এই মনোভাবই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়। বলকান যুদ্ধই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করেছিল।

৫. ত্রিশক্তি আতাঁত (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে) গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। (ক. বি. ২০০৪)

অথবা

কোন পরিস্থিতিতে ত্রিশক্তি আতাঁত গড়ে ওঠে? (ব. বি. ২০১০)

অথবা

ত্রিশক্তি আঁতাত গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করো। (ব. বি. ২০০৮/২০০৬)

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর ইউরোপের ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধ। এই বিরোধের সূত্র ধরে ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি আঁতাত নামে দুটি শক্তিজোট গড়ে ওঠে। এর ফলস্বরূপ ইউরোপ দুটি শক্তিজোট এবং সশস্ত্র শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার চ্যান্সেলার বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির ফলস্বরূপ অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক সম্মানহানি ঘটে। ১৮৭০–১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ও ফ্রান্সের শত্রুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এছাড়া ঐক্য সাধনের পরবর্তীকালে জার্মানির এই ব্যাপক পরিবর্তন রাশিয়াকে উদ্বিগ্ন করে। এমনকি বিসমার্কের সমর্থনে কৃষ্ণসাগরের ওপর রাশিয়ার বিশেষ অধিকার স্থাপন এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্ককোর্টের চুক্তিতে ফ্রান্সের ওপর কঠোর শর্তাদি আরোপ প্রভৃতিতে ইংল্যান্ড জার্মানির ওপর বিরক্ত হয়। এমতাবস্থায় ইউরোপে জার্মান বিরোধী একটি শক্তিজোট গঠিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু, নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যক্রমে অস্ট্রিয়া পূর্ব ইউরোপের সমস্যা নিয়ে জর্জরিত হয়ে বলকান অঞ্চলে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিসমার্কের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এর ফলে অস্ট্রিয়াকে শান্ত করার সুযোগ বিসমার্ক অতি সহজেই লাভ করেন। তাছাড়া সম্ভবত বিসমার্ক এরকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভবের কথা চিন্তা করেই স্যাডোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর অস্ট্রিয়ার ওপর কোনও কঠোর চুক্তি আরোপ না করে তার সঙ্গে মিত্রতার পথ খোলা রাখেন।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আবার নিকট প্রাচ্য সমস্যা জটিল আকার ধারণ করলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। রাশিয়া তুরস্ককে পরাজিত করে

Scanned with CamScanner

তার ওপর স্যানস্টিকেনোর চুক্তি চাপিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চুক্তির শর্ত সম্পর্কে ইংল্যান্ডের প্রবল আপত্তি থাকায় স্যানস্টিফেনোর শর্তগুলি পুনর্বিবেচনা করার জন্য ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের বক্তব্য একটি সম্মেলনের কাছে পেশ করতে বাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিসমার্ক বসনিয়ার ওপর অস্ট্রিয়ার দাবি সমর্থন করেন এবং হারজিগোভিনা ও বসনিয়া প্রদেশ দুটি অস্ট্রিয়াকে দখল করার সুযোগ দান করেন। রাশিয়া এতে অসন্তুষ্ট হয় এবং রুশ-জার্মান মৈত্রী সম্পর্কে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় এবং অপরদিকে জার্মানি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন করে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রো-জার্মান চুক্তিতে বলা হয় যে, স্বাক্ষরকারীদের দুটির যে কোনও একটি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে অপর দেশটি সমস্ত রকম সামরিক শক্তি দিয়ে আক্রান্ত দেশটিকে সাহায্য করবে। এই চুক্তির আরেকটি শর্তে বলা হয় যে, স্বাক্ষরকারী দেশ দুটির কোনও একটি যদি রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে অন্য দেশটি বন্ধুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। যদি আক্রমণকারী তৃতীয় রাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হলে স্বাক্ষরকারী অন্য দেশটি অবশ্য মিত্রতায় আবদ্ধ দেশটিকে সামরিক সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। অস্ট্রো-জার্মান চুক্তির ফলে বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভ করেন।

এই চুক্তির তিন বছর পরে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির দ্বিশক্তিচুক্তি অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং ইতালির মধ্যে সম্পাদিত ত্রিশক্তি চুক্তিতে পরিণত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশকে জার্মানির বৃত্তের মধ্যে আনা নিসন্দেহে বিসমার্কের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। কারণ জার্মানির টিউটনিক শক্তিদ্বয়ের সঙ্গে ল্যাটিন শক্তি ইতালির প্রায় কোন সাদৃশ্যই ছিল না। বিশেষ করে ইতালির ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সংযুক্তি সাধনের সময় ইতালি প্রতিক্ষেত্রেই অস্ট্রিয়ার কাছে বাধা পেয়েছে। এই রকম অবস্থায় বিসমার্কও ইতালির সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কথা ভাবতে পারেননি। প্রধানত দুটি কারণে জার্মান রাষ্ট্র দুটির সঙ্গে ইতালির মিত্রতা স্থাপিত হয়। প্রথমত, ইতালির আশঙ্কা হয় যে, ফরাসি সৈন্যদের সাহায্যে পোপ আবার রোম অধিকার করার চেষ্টা করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইতালি টিউনিস অধিকার করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিসের অধিকার করলে ইতালি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ভবিষ্যতে ইতালির উপনিবেশ বিস্তারে ফ্রান্স যাতে বাধা দিতে সাহসী না হয় সেজন্য ইতালি ত্রিশক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সম্পাদিত ত্রিশক্তি

Scanned with CamScanner

চুক্তি পাঁচ বছর সময় কালের জন্য করা হয় এবং স্থির হয় যে, পাঁচ বছর পর আবার তার পুর্ণনবীকরণ করা হবে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইতালি ত্রিশক্তি চুক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়।

ত্রিশক্তি আঁতাত: ১৮৫৩–৫৬ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে ইংল্যান্ড ইউরোপের রাজনীতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে, জার্মানির সংযুক্তি সাধন এবং ইতালির সংযুক্তি সাধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায়ও ইংল্যান্ড প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু, উনিশ শতাব্দীর আশির দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ড তার বিচ্ছিন্ন নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন সম্মেলনের পর অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং দ্বিশক্তি চুক্তি স্থাপিত হলে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র নায়কগণ মিত্রশক্তি সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের পর জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে রি-ইনস্যুরেন্স চুক্তি পুর্ণনবীকরণ করতে অস্বীকার করে। এর ফলে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটি দ্বিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। রাশিয়া ও ফ্রান্স এই দুটি দেশের সঙ্গেই ইংল্যান্ডের ছোট বড় নানারকম বিরোধ তখন বর্তমান ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রিচুক্তি স্থাপিত হওয়ার ফলে দূর প্রাচ্যে রাশিয়া কর্তৃক এবং মিশর অঞ্চলে ফ্রান্স কর্তৃক ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের স্বার্থ হানি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেজন্য দ্বিশক্তি চুক্তি সম্পর্কে ইংল্যান্ড প্রথম থেকেই সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে এবং এই চুক্তিকে ত্রিশক্তি চুক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে জার্মানির কাছে একটি চুক্তি প্রস্তাব করে। কিন্তু, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংল্যান্ডের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়া বোয়ার যুদ্ধের সময় (১৮৯৯–১৯০২) জার্মান সম্রাট বোয়ারদের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাদের পক্ষ গ্রহণ করে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার হুমকি দেন। এই রকম পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড তার বিচ্ছিন্নতাবাদের ত্রুটিগুলি উপলব্ধি করে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নীতি পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। ইংল্যান্ডের এই পরিবর্তিত চিন্তাধারার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তির মধ্যে। নানা দিক থেকে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করা।

তবে প্রকৃতপক্ষে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাতই প্রকৃত পক্ষেই ইংল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতা পর্বের অবসান ঘটায়। ইতিমধ্যে জার্মানির নৌশক্তি

Scanned with CamScanner

বৃদ্ধির ফলে ইংলান্ডের নৌশক্তি এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এমনকি ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার সম্মুখীন হয়। ইতিপূর্বে জার্মানি ইংল্যান্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেখা দিতে সমর্থ হয়েছে। এরকম শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়ে ইংল্যান্ড দীর্ঘকাল যাবৎ যে সমস্ত শক্তির সঙ্গে তার বিরোধিতা অব্যাহত ছিল সেই সব শক্তির সঙ্গে নতুন করে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। যদিও গত ২০ বছর যাবৎ উপনিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের নানা রকম বিরোধ দেখা দিয়েছিল, তথাপি ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সঙ্গে প্রথম মৈত্রী সম্পর্কে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের কূটনীতির ফলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের একটি আঁতাত বা মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই চুক্তির দ্বারা উভয় দেশের মধ্যেকার সমস্ত পুরনো সমস্যার সমাধান করা হয়। মিশর ও মরক্কোর প্রশ্নে পারস্পরিক দাবী স্বীকার করে নেওয়া হয়। মিশরের উপর ইংলান্ডের বিশেষ অধিকারের ব্যাপারে ফ্রান্স সমর্থন জানায় এবং ইংল্যান্ড মরক্কোর ওপর ফ্রান্সের দাবি স্বীকার করে।

ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ফ্রান্স। ১৯০৪–০৬ খ্রিস্টাব্দে রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার অপ্রত্যাশিত পরাজয় দূর প্রাচ্যে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটায়। প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার দূর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে ইংল্যান্ড রাশিয়ার ওপর অযৌক্তিক কোনও চুক্তি আরোপ করতে মিত্রপক্ষ জাপানকে নিষেধ করে। ইংল্যান্ডের এই ব্যবহারে রাশিয়া তার ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নিকট প্রাচ্যে জার্মানির কার্যকলাপে দুই শত্রু রাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডকে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং দুটি দেশ নিজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তুরস্কের সঙ্গে জার্মানির ঘনিষ্ঠতা এবং বার্লিন-বাগদান রেলপথ নির্মাণের প্রস্তুতি ইংল্যান্ড ও রাশিয়া উভয় দেশের কাছেই বিপজ্জনক ছিল। এরকম অবস্থায় ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী উভয় পক্ষ পারস্য দেশে তাদের প্রভাব বিস্তারের সীমানা নির্দিষ্ট করে নেয় এবং রাশিয়া তিব্বত ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের মনে ভীতির উদ্রেক করা থেকে বিরত থাকতে স্বীকৃত হয়। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন করে ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স। অন্যদিকে ত্রিশক্তি চুক্তি গঠন করে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি। সশস্ত্র সামরিক বাহিনী নিয়ে এই দুটি শক্তিজোট পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইউরোপীয় মঞ্চ প্রস্তুত করেন।

Scanned with CamScanner

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ত্রিশক্তি আঁতাত কোন অর্থেই মৈত্রী চুক্তি ছিল না। কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হলে রাশিয়া বা ফ্রান্সকে সাহায্য দানের কোনও প্রতিশ্রুতিই ইংল্যান্ড দেয়নি। ত্রিশক্তি আঁতাত ছিল একটি কূটনৈতিক চক্র যার সদস্যগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তবে এই আঁতাতের সামরিক গুরুত্ব না থাকলেও এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল সীমাহীন। ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাত ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যেকার দূরত্বকে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলে ফ্রান্সের আত্মবিশ্বাস প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন প্রমাণ করে রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর ইউরোপে মিত্র সন্ধানে সচেষ্ট। এই সময় থেকেই রাশিয়া বলকান অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে জার্মান বিরোধী নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। অন্যদিকে জার্মানি উপলব্ধি করে যে, একটি শত্রুবলয় তাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার যুক্তি হিসেবে এই শত্রু বেষ্টনীর কথাই জার্মানি বারবার উল্লেখ করেছে।

Scanned with CamScanner